আন্তর্জাতিক চা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তারা

শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার

বণিক বার্তা ২২ মে, ২০২১
নিজস্ব প্রতিবেদক

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলার ১৫৮টি চা বাগানে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৩৬৮ জন শ্রমিক কাজ করেন। তাদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ শ্রমিকই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছেন। মজুরিবৈষম্যসহ বিভিন্ন বঞ্চনার কারণে এসব জনগোষ্ঠীর মানুষ অন্যান্য নাগরিকের চেয়ে এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছে। এ অবস্থায় চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আন্তর্জাতিক চা দিবস উপলক্ষে গতকাল সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের (সেড) উদ্যোগে আয়োজিত এক ওয়েবিনারে এসব কথা বলেন বক্তারা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সচিব কেএম আব্দুস সালাম। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) চেয়ারম্যান শাহ আলম।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেডের পরিচালক ফিলিপ গাইন। ওয়েবিনারে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিজেরা করির সমন্বয়ক খুশী কবির, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তমিজুদ্দিন খান। ওয়েবিনারের মিডিয়া পার্টনার ছিল বণিক বার্তা।

ওয়েবিনারে চা শ্রমিকদের দারিদ্র্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন আলোচকরা। তারা বলেন, মজুরিবৈষম্যসহ বিভিন্ন বঞ্চনার কারণে চা শ্রমিকরা অন্যান্য নাগরিকের চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে আছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও ইউনিসেফের ২০১৮ সালের এক জরিপের ফলাফল অনুসারে, চা বাগানের ৭৪ শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। অথচ ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪ শতাংশ।

শ্রমিকদের মজুরিবৈষম্য নিয়ে ওয়েবিনারে উপস্থিত বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা বলেন, চা উৎপাদনকারী দেশগুলোয় বাংলাদেশের চা শ্রমিকরা সবচেয়ে কম মজুরি পান। নগদ মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা মিলিয়ে একজন শ্রমিকের বর্তমান দৈনিক আয় ২০০ টাকা। তবে বাগান মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) হিসাবে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ২৭০ টাকা। এক হিসাব অনুযায়ী, যেসব শ্রমিক মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন, তাদের দৈনিক মজুরি ৩৮৯ টাকা। যারা কারখানায় কাজ করেন তারা পান ৩৪৭ টাকা। তবে মালিকপক্ষের এ দাবিকে কোনোভাবেই মানতে রাজি নন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের (বিসিএসইউ) সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরী। তিনি বলেন, একজন চা শ্রমিক যে মজুরি পান তা কোনোভাবেই ন্যায্য মজুরির ধারেকাছেও পড়ে না।

করোনাকালীন সময়ে চা শ্রমিকদের দুর্বিষহ জীবনের বিষয়টি তুলে ধরে বক্তারা বলেন, সুরক্ষামাগ্রী-মাস্ক, হ্যান্ডস্যানিটাইজার, কভিড-১৯ পরীক্ষার সুযোগ, ছুটি এবং অনুদান এক কথায় কিছুই পায়নি চা শ্রমিকরা। পাঁচ প্রজন্ম ধরে চা শ্রমিকরা একই পেশায় যুক্ত আছেন। এদের নেই কোনো নিজস্ব জমি, ভিটা বা বাড়ি। এসব শ্রমিক বাগান মালিক ও রাষ্ট্রের ওপর নিভ্রশীল জীবনযাপন করছে। অধিকাংশ শ্রমিকই বেতনবৈষম্যের শিকার। এমনকি কভিডকালেও চা

শ্রমিকরা কোনো সুযোগ-সুবিধা পাননি। করোনা পরীক্ষা কিংবা করোনাকালীন ছুটিও এদের ভাগ্যে জোটেনি। অনুদান তো দূরের কথা, কভিড থেকে নিরাপদ থাকতে সুরক্ষাসামগ্রীও তারা পাননি।

ওয়েবিনারে বলা হয়, বাংলাদেশের চা বাগানে কমব্রত শ্রমিকদের অধিকাংশই অবাঙালি। শ্রীলংকার চা বাগানে কমব্রত শ্রমিকদের সঙ্গে বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের পার্থক্য হলো, শ্রীলংকার সব চা শ্রমিক তামিল। কিন্তু বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের জাতি পরিচয় খুবই বৈচিত্রপূর্ণ। সেডের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৫৬টি চা বাগানে গবেষণা চালিয়ে দেখা যায়, অন্তত ৮০টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী চা শ্রমিক হিসেবে কমব্রত আছে। এর মধ্যে ২০১৯ সালে সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংশোধিত তালিকায় ২৩টি জাতিগোষ্ঠীকে নথিভুক্ত করা হয়।

বৈচিত্র্যপূর্ণ চা শ্রমিকদের মধ্যে এখনো ১২টি ভাষা টিকে আছে। যদিও অধিকাংশ পরিপূর্ণ ভাষার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। নানা ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক চা শ্রমিকদের পরিবার আধুনিক জীবনধারা থেকে পিছিয়ে আছে মন্তব্য করে বক্তারা বলেন, দুঃখজনকভাবে চা শ্রমিক ও তাদের পরিবার চা বাগানেই আটকে আছেন। চা শ্রমিকরা বাংলাদেশের নাগরিক। তারা যেকোনো জায়গায় যেতে পারেন। যেকোনো স্থানে বসবাস করার অধিকারও তাদের আছে। কিন্তু তারা বংশ পরম্পরায় চা বাগানে যুক্ত হয়ে আছেন।

চা শ্রমিকের আবাসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভের সুযোগের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বক্তারা বলেন, তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বাগান মালিকের। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর পঞ্চম তফসিলে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে। শুধু তা-ই নয়, ঘর মেরামতের দায়িত্বও বাগান মালিকের। চা শ্রমিকরা বাগান মালিকের দেয়া গৃহের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন। বাংলাদেশ টি বোর্ডের ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, চা বাগানে পাকা ঘরের সংখ্যা ১৮ হাজার ৪৯০। আর কাঁচা ঘরের সংখ্যা ৫৭ হাজার ৫৯। এ অবস্থা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। গৃহ নিয়ে আরো নানা উদ্বেগ আছে। শ্রম আইনে যেসবের মীমাংসা হওয়া দরকার।

ওয়েবিনারে বলা হয়, চা বাগানগুলোয় বাগান ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি আছে। কিন্তু এসব হাসপাতালে যে চিকিৎসা পাওয়া যায়, তাতে শ্রমিকরা সন্তুষ্ট নন। ক্যান্সার, যক্ষ্মাসহ বড় কোনো রোগে পড়লে বাগানের হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিতে ভালো চিকিৎসা মেলে না। শ্রম আইন ও বিধিমালায় যেসব প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা এবং অন্য সুযোগ-সুবিধা চা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের পাওয়ার কথা, তার অনেক কিছুই তারা পান না। তবে চা বাগানের কাছাকাছি যেসব সরকারি স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে চা শ্রমিকদের যেতে বাধা নেই। তাদের কেউ কেউ সেখানে যাচ্ছেনও। সংগত কারণেই তাদের সংখ্যা কম।